بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ০৯ ডিসেম্বর ২০২২ মোতাবেক ০৯ ফাতাহ্ ১৪০১ হিজরী শামসীর জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

গত জুমুআর খুতবায় শেষদিকে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) সর্ম্পকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কিছু উদ্ধৃতি উপস্থাপন করেছিলাম, এ সম্পর্কে তাঁর আরো কিছু উদ্ধৃতি রয়েছে তা এখন উপস্থাপন করছি।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **নিঃসন্দেহে হযরত আবু বকর সিদ্দীক ও উমর ফারুক (রা.) সেই কাফেলার আমীর ছিলেন যারা আল্লাহ্‌র খাতিরে অনেক উচ্চশৃঙ্গ জয় করেছেন। তারা সভ্য ও আরব বেদুইনদের সত্যের (প্রতি) আহ্বান জানিয়েছেন। এমনকি তাদের এই আহ্বান দূরদূরান্তের দেশসমূহে ছড়িয়ে পড়ে এবং তাঁদের উভয়ের খিলাফতকাল ব্যাপকহারে ইসলামের ফল-ফলাদিতে পরিপূর্ণ করা হয় আর বহুমুখী সাফল্য ও জয়ের সর্বব্যাপী সৌরভে তা সুরভিত করা হয়েছে। সিদ্দীকে আকবরের যুগে ইসলাম বিভিন্ন প্রকার নৈরাজ্যের আগুনে জর্জরিত ছিল। তাঁর জামা'তের ওপর আগ্রাসী বাহিনী প্রকাশ্যে আক্রমণোদ্যত ছিল আর একে লুটে নিয়ে জয়ধ্বনি দেওয়ার জন্য উদগ্রীব ছিল। অতএব ঠিক সেই সময় হযরত আবু বকর (রা.)'র নিষ্ঠার কারণে মহা প্রতাপান্বিত খোদা ইসলামের সাহায্যে এগিয়ে আসেন এবং তিনি (রা.) গভীর কূপ থেকে ইসলামরূপী মূল্যবান সম্পদ উদ্ধার করেন। অতএব ইসলাম চরম দুর্দশার অবস্থা হতে উত্তম অবস্থার দিকে ফিরে আসে। কাজেই আমাদের কাছে ন্যায়বিচারের আবশ্যিক দাবি হলো, আমরা যেন এই সাহায্যকারীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি এবং শত্রুদের (প্রতি) ভ্রূক্ষেপ না করি। অতএব তুমি তাঁর কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না যিনি তোমার প্রিয় নেতা ও অভিভাবক (সা.)-কে সাহায্য করেছেন এবং তোমার ধর্ম ও গৃহের সুরক্ষা করেছেন আর আল্লাহ্‌র খাতিরে তোমার হিত কামনা করেছেন, কিন্তু এর বিনিময়ে তোমার কাছে কোনো প্রতিদান চান নি। অতএব সিদ্দীকে আকবরের সুউচ্চ মর্যাদা ও মাহাত্ম্যকে অস্বীকার করা বড়ই আশ্চর্যজনক বিষয়। অথচ বাস্তবতা হলো, তাঁর প্রসংশনীয় গুণাবলী সূর্যের ন্যায় দেদীপ্যমান আর নিঃসন্দেহে প্রত্যেক মু'মিন তাঁর রোপিত বৃক্ষের ফল খাচ্ছে এবং তাঁর শেখানো জ্ঞানভাণ্ডার থেকে কল্যাণমণ্ডিত হচ্ছে। তিনি আমাদের ধর্মের জন্য ফুরকান এবং আমাদের পার্থিব জীবনের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তা দান করেছেন। যে (তাঁকে) অস্বীকার করেছে সে মিথ্যা বলেছে আর ধ্বংস ও শয়তানের সাথে মিলিত হয়েছে।** তিনি (আ.) বলেন, **এছাড়া যাদের কাছে তাঁর পদমর্যাদার বিষয়টি সন্দেহযুক্ত ছিল, এমন মানুষ মূলত পাপাচারী এবং তারা (গভীর) জলরাশিকে সামান্য (পানি) মনে করেছে। অতএব সে ক্রোধান্বিত হয়ে এমন ব্যক্তির অসম্মান করেছে, যিনি প্রথম সারির সম্মানিত ও শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন।** তিনি (আ.) বলেন, **বস্তুত হযরত সিদ্দীকের মহান ব্যক্তিসত্তা আশা-আকাঙ্ক্ষা, ভয়ভীতি, ভালোবাসা ও প্রেমপ্রীতির সমাহার ছিল। তাঁর প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য সততা ও স্বচ্ছতার ক্ষেত্রে উৎকর্ষময় ও পরিপূর্ণ ছিল আর তিনি মহামহিম খোদার প্রতি সম্পূর্ণরূপে বিনত ছিলেন এবং প্রবৃত্তি ও এর আকর্ষণ থেকে বিমুক্ত এবং কামনা-বাসনা ও**

এর তাড়না হতে সম্পূর্ণরূপে দূরে ছিলেন। তিনি চরম পর্যায়ের জগদ্বিমুখ খোদাপ্রেমী মানুষ ছিলেন এবং তাঁর মাধ্যমে শুধু সংশোধনই সাধিত হয়েছে আর তাঁর দ্বারা মু'মিনদের জন্য কেবল মঙ্গল ও কল্যাণই প্রকাশ পেয়েছে। (কাউকে) দুঃখ ও কষ্ট দেয়ার অপবাদ থেকে তিনি মুক্ত ছিলেন, তাই তুমি আভ্যন্তরীণ বিবাদবিসম্বাদের প্রতি দৃষ্টি দিও না, বরং এগুলোকে কল্যাণ হিসেবেই গণ্য করো। তুমি কি প্রণিধান করো নি যে, সেই ব্যক্তি যিনি স্বীয় প্রভুর নির্দেশাবলী ও সন্তুষ্টির খাতিরে নিজের সন্তানসন্ততিকে সম্পদশালী করার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করেন নি অথবা তাদেরকে নিজ ধনসম্পদের উত্তরাধিকার বানাতে পারেন। বরং জগৎ থেকে তিনি শুধু ততটুকু অংশই গ্রহণ করেছেন যতটুকু তাঁর চাহিদা পূরণে যথেষ্ট ছিল। তাহলে তুমি কীভাবে ভাবতে পারো যে, তিনি মহানবী (সা.)-এর বংশধরের প্রতি অন্যায় অবিচার করে থাকবেন?

পুনরায় তিনি (আ.) বলেন, **সিদ্দীকে আকবরের প্রতি আল্লাহ্ কল্যাণরাজি বর্ষণ করুন। তিনি ইসলামকে জীবিত করেছেন এবং যিন্দিকদের (অর্থাৎ রাষ্ট্রদ্রোহী মুরতাদদের) হত্যা করেছেন আর কিয়ামত পর্যন্ত স্বীয় কল্যাণধারা প্রবহমান করেছেন। তিনি অনেক আহাজারি করতেন এবং একান্ত জগদ্বিমুখ খোদানুরাগী (ব্যক্তি) ছিলেন। এছাড়া প্রভুর সম্মুখে কাকুতিমিনতি করা, দোয়া ও (তাঁর) সমীপে ভূলুণ্ঠিত থাকা এবং তাঁর দ্বারে ক্রন্দন ও বিনয়ের সাথে বিনীত থাকা আর তাঁর দরজার চৌকাঠ আঁকড়ে রাখা তাঁর অভ্যাস ছিল। সিজদাবস্থায় তিনি সর্বশক্তি নিয়োগ করে দোয়া করতেন আর কুরআন তিলাওয়াতের সময় কাঁদতেন। নিঃসন্দেহে তিনি ইসলাম ও রসূলদের গৌরব। তাঁর প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মহানবী (সা.)-এর স্বভাবজ গুণাবলীর নিকটতর। নবুয়্যতের (আধ্যাত্মিক) সুবাস নেয়ার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন যোগ্যতম লোকদের মাঝে প্রথম। মহান একত্রকারী (সা.)-এর হাতে কিয়ামতসদৃশ আধ্যাত্মিক যে অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়েছে তা প্রত্যক্ষকারী লোকদের মধ্যে তিনি (রা.) প্রথম সারিতে ছিলেন এবং তাদের মাঝেও সর্বাগ্রে ছিলেন যারা নিজেদের মলিন চাদরকে পূত-পবিত্র পোশাকে পরিবর্তন করেছেন, আর নবীদের অধিকাংশ বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে তিনি নবীদের সাথে সাদৃশ্য রাখতেন। আমরা পবিত্র কুরআনে (একমাত্র) তাঁর উল্লেখ ছাড়া অন্য কোনো সাহাবীর উল্লেখের কথা শুধু অনুমান ও ধারণাকারীদের ধারণা ছাড়া সুনিশ্চিতভাবে দেখতে পাই না। অথচ অনুমান তো নিশ্চিত সত্যের বিপরীতে কোনো মূল্যই রাখে না আর তা অনুসন্ধানী (জাতিকে) পরিতৃপ্তও করতে পারে না। যে তাঁর সাথে শত্রুতা করে– তার ও সত্যের মাঝে এমন একটি রুদ্ধ দ্বার অন্তরায় (হিসেবে) রয়েছে যা সিদ্দীকদের নেতার কাছে সমর্পিত না হওয়া পর্যন্ত কখনো খুলবে না।**

তিনি (আ.) আরো বলেন, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-কে সৃষ্টিই করা হয়েছে কল্যাণের উৎসের প্রতি নিবিষ্ট হওয়া এবং রহমান খোদার রসূল (সা.)-এর প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার বৈশিষ্ট্য দিয়ে। নবুয়্যতের বৈশিষ্ট্য প্রকাশের ক্ষেত্রে তিনি সকল মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি যোগ্য এবং সর্বশ্রেষ্ঠ মানব মহানবী (সা.)-এর খলীফা হওয়ার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত ছিলেন। তিনি তাঁর অনুসৃত নেতা (সা.)-এর সাথে চরম সংগতি ও সামঞ্জস্য রাখার যোগ্য ছিলেন। অনুরূপভাবে তিনি সকল নৈতিক গুণাবলী ও অভ্যাস অবলম্বন করা এবং আপন-পর সবার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার ক্ষেত্রে মহানবী (সা.)-এর এমন প্রতিচ্ছবি ছিলেন যে, তরবারি ও বর্শার জোরেও তাঁদের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ছিন্ন হয় নি, আর সারা জীবন তিনি এমনই ছিলেন। বিপদাপদ, ভয়ঙ্কর হাতিয়ার এবং অভিসম্পাত বা তিরস্কার কিছুই তাঁকে

অস্থির করতে পারে নি। তাঁর আত্মিক গুণাবলীর প্রধান বৈশিষ্ট্যই ছিল সততা, স্বচ্ছতা, দৃঢ়চিত্ততা এবং খোদাভীতি। গোটা পৃথিবীও যদি মুরতাদ হয়ে যেতো তাতেও তিনি ভ্রূক্ষেপ করতেন না এবং পিছপাও হতেন না, বরং সদা অব্যাহতভাবে এগিয়ে যেতেন। আর এ কারণেই আল্লাহ্ নবীদের পরেই সিদ্দীকদের কথা উল্লেখ করে বলেছেন, فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ (সূরা আন্ নিসা: ৭০)। এই আয়াতে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) এবং অন্যদের ওপরে তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। কেননা মহানবী (সা.) সাহাবীদের মধ্য হতে তাঁর ছাড়া অন্য কোনো সাহাবীর নাম সিদ্দীক রাখেন নি যেন তিনি তাঁর পদমর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের মহিমাকে প্রকাশ করতে পারেন। কাজেই অভিনিবেশকারী ও চিন্তাশীলদের মতো প্রণিধান করো! এই আয়াতে পুণ্যবানদের জন্য (আধ্যাত্মিক) উৎকর্ষের বিভিন্ন স্তর এবং এর যোগ্য লোকদের প্রতি অনেক বড় ইঙ্গিত রয়েছে। তাই আমরা যখন এই আয়াতের প্রতি অভিনিবেশ করেছি এবং চিন্তাকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছি তখন এটি সুস্পষ্ট হয় যে, এই আয়াত হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)'র আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের সবচেয়ে বড় সাক্ষী আর এতে একটি গভীর রহস্য রয়েছে যা প্রত্যেক সেই ব্যক্তির সম্মুখে উন্মোচিত হয় যে অনুসন্ধিৎসু হয়। অতএব আবু বকর (রা.) হলেন সেই ব্যক্তি যাকে (আল্লাহ্‌র) প্রিয় রসূল (সা.)-এর পবিত্র মুখ দ্বারা সিদ্দীক উপাধি দেয়া হয়েছে, আর পবিত্র কুরআন নবীদের সাথে যুক্ত করে সিদ্দীকদের উল্লেখ করেছে যা বিবেকবানদের অজানা নয়। পক্ষান্তরে আমরা সাহাবীদের মধ্য হতে অন্য কোনো সাহাবীর অনুকূলেই এই উপাধি ও পদবীর প্রয়োগ দেখি না। এভাবে বিশ্বস্ত সিদ্দীকের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হলো, কেননা নবীদের পরেই তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

পুনরায় তিনি (আ.) বলেন, ইবনে খলদূন বলেন, (অন্তিম অসুস্থতার সময়) **মহানবী (সা.)-এর কষ্ট যখন বেড়ে যায় এবং তিনি (সা.) অচেতন হয়ে পড়েন তখন তাঁর সহধর্মিনীগণ এবং পরিবারের অন্য সদস্যগণ, (যেমন–) আব্বাস ও আলী মহানবী (সা.)-এর কাছে জড়ো হন। এরপর নামাযের সময় হলে তিনি (সা.) বলেন, আবু বকরকে লোকদের ইমামতি করে নামায পড়াতে বলো।** তিনি (আ.) পুনরায় বলেন, ইবনে খলদূন বলেন, তিনটি বিষয়ে ওসীয়্যত করার পর মহানবী (সা.) বলেন, **আবু বকরের দরজা ছাড়া মসজিদমুখী খুলে এমন সব দরজা বন্ধ করে দাও। কেননা সাহাবীদের মাঝে অনুগ্রহের ক্ষেত্রে আবু বকরের তুলনায় শ্রেষ্ঠ কোনো সাহাবীকে আমি চিনি না।**

তিনি (আ.) আরো বলেন, ইবনে খলদূন উল্লেখ করেছেন, **হযরত আবু বকর (রা.) মহানবী (সা.)-এর (মৃতদেহের) কাছে আসেন এবং তাঁর পবিত্র মুখমণ্ডল থেকে কাপড় সরিয়ে চুমু খান এবং বলেন, আমার পিতামাতা আপনার জন্য উৎসর্গিত। আল্লাহ্ আপনার জন্য যে মৃত্যু নির্ধারিত রেখেছিলেন আপনি তার স্বাদ গ্রহণ করেছেন, কিন্তু এরপর আর কখনোই আপনার ওপর মৃত্যু আসবে না।** তিনি বলেন, **তাঁর (রা.) প্রতি আল্লাহ্ তা'লার সূক্ষ্ম অনুগ্রহরাজি এবং মহানবী (সা.)-এর একান্ত নৈকট্যের যে বিশেষত্ব তিনি লাভ করেছিলেন যেমনটি ইবনে খলদূন বিধৃত করেছেন তা হলো, আবু বকর (রা.)-কে সেই খাটিয়াতেই বহন করা হয়েছে যেটিতে মহানবী (সা.)-কে বহন করা হয়েছিল; তাঁর কবরও মহানবী (সা.)-এর কবরের ন্যায় সমান করা হয় এবং সাহাবীরা তাঁর কবরকে মহানবী (সা.)-এর কবরের একেবারে নিকটে বানিয়েছেন, আর তাঁর (রা.) মাথা মহানবী (সা.)-এর উভয় কাঁধের বরাবর**

রাখেন। তিনি (রা.) সর্বশেষ যে বাক্য উচ্চারণ করেছিলেন তা হলো, হে আল্লাহ্! আমাকে আত্মসমর্পিত অবস্থায় মৃত্যু দাও এবং আমাকে পুণ্যবানদের মাঝে গণ্য করো।

পুনরায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, আবু বকর (রা.) একজন নিতান্তই বিরল খোদাপ্রাপ্ত মানুষ ছিলেন যিনি আঁধার-অমানিশার পর ইসলামের মুখমণ্ডলকে উজ্জ্বল করেছেন এবং তাঁর পূর্ণ প্রচেষ্টা এটিই ছিল যে, যে ইসলাম পরিত্যাগ করেছে তিনি তার মোকাবিলা করেছেন এবং যে সত্যকে অস্বীকার করেছে তিনি তার সাথে যুদ্ধ করেছেন, আর যে ইসলামের গৃহে প্রবেশ করেছে তার সাথে তিনি নম্র ও স্নেহসুলভ ব্যবহার করেছেন। ইসলাম প্রচারের জন্য তিনি অনেক কষ্ট সহ্য করেছেন। তিনি মানুষকে দুষ্প্রাপ্য মণিমুক্তা দান করেছেন এবং নিজের পবিত্র দৃঢ় সংকল্প দ্বারা বেদুইনদের সভ্যতা-ভব্যতা শিখিয়েছেন আর সেসব বল্গাহীন উট বা অসামাজিক লোকদের পানাহার, ওঠাবসা প্রভৃতির শিষ্টাচার, পুণ্যের পথের দিশা ও যুদ্ধক্ষেত্রে বীরত্ব ও উদ্যম (প্রদর্শনের) রীতি শিখিয়েছেন। এছাড়া তিনি চতুর্দিকে নৈরাশ্য দেখেও কাউকে যুদ্ধের বিষয়ে জিজ্ঞেস করেন নি, বরং নিজেই শত্রুপক্ষের প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য দণ্ডায়মান হয়েছেন। প্রত্যেক ভীরু ও অসুস্থ ব্যক্তির মতো অলীক কল্পনা তাঁকে বিভ্রান্ত করে নি। প্রত্যেক নৈরাজ্য ও বিপদের ক্ষেত্রে এটি প্রমাণিত হয়েছে, তিনি রেযওয়া পর্বতের চেয়েও বেশি দৃঢ় ও অবিচল। [এটি মদীনার একটি পাহাড়ের নাম।] তিনি প্রত্যেক মিথ্যা নবুয়্যতের দাবিদারকে ধ্বংস করেছেন এবং আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে (আত্মীয়তার) সকল সম্পর্ককে ছিন্ন করেছেন। তাঁর সমস্ত আনন্দ ইসলামের বাণীকে সমুন্নত করা এবং সর্বশ্রেষ্ঠ মানব (সা.)-এর আনুগত্যের মাঝে নিহিত ছিল। অতএব স্বীয় ধর্মের সুরক্ষাকারী হযরত আবু বকরের আঁচল আঁকড়ে ধরো আর বৃথা বাক্যালাপ পরিত্যাগ করো।

তিনি (আ.) বলেন, এছাড়া আমি যা কিছু বলেছি তা প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার অনুসরণকারী ব্যক্তির ন্যায় কিংবা পিতৃপুরুষের ধারণার অনুসারীদের ন্যায় বলি নি। বরং যখন থেকে আমার পা হাঁটতে ও আমার কলম লিখতে আরম্ভ করেছে আমার কাছে এটিই প্রিয় যে, আমি যেন গবেষণাকে নিজের ব্রত এবং চিন্তা ও প্রণিধানকে নিজের লক্ষ্য ধার্য করি। আমি পূর্ণ গবেষণা করেছি। তিনি (আ.) বলেন, আমি প্রতিটি সংবাদকে যাচাই বাছাই করতাম এবং প্রত্যেক জ্ঞানীকে প্রশ্ন করতাম। অতএব আমি হযরত আবু বকর সিদ্দীককে সত্যিকার অর্থেই সত্যবাদী পেয়েছি এবং গবেষণার ভিত্তিতে এই বিষয়টি আমার কাছে প্রকাশিত হয়েছে। আমি যখন তাকে সকল ইমামের ইমাম এবং ধর্ম ও উম্মতের প্রদীপ হিসেবে পেয়েছি, তখন আমি তাঁর আঁচল দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরেছি এবং তাঁর নিরাপত্তার ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছি আর পুণ্যবানদের ভালোবেসে স্বীয় প্রভুর কৃপা অর্জন করতে চেয়েছি। অতএব সেই কৃপালু খোদা আমার প্রতি কৃপা করেছেন, আশ্রয় দিয়েছেন, আমাকে সাহায্য করেছেন এবং আমার তরবিয়্যত করেছেন আর আমাকে সম্মানিত লোকদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। অধিকন্তু স্বীয় বিশেষ অনুগ্রহে আমাকে এই শতাব্দীর মুজাদ্দিদ ও প্রতিশ্রুত মসীহ্ বানিয়েছেন। এছাড়া আমাকে এলহামপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন, আমার দুঃখ দূর করেছেন এবং আমাকে সে সবকিছু দান করেছেন যা (সমসাময়িক) সমগ্র বিশ্বে অন্য কাউকে দান করেন নি। আর এ সবই সেই উম্মী নবী (সা.) এবং সেসব নৈকট্যপ্রাপ্তদের ভালোবাসার কারণে লাভ হয়েছে। হে আল্লাহ্! তুমি তোমার সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল ও খাতামুল আম্বিয়া এবং জগতের সকল মানবের চেয়ে উত্তম সত্তা মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি কল্যাণ ও শান্তি অবতীর্ণ করো। খোদার কসম! হযরত আবু বকর হারামাইন তথা দুটি পবিত্র গৃহ এবং দুটি কবরেও আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)-

এর সঙ্গী। এর দ্বারা আমার (বলার) উদ্দেশ্য হলো প্রথমত সেই গুহার কবর যেখানে তিনি উৎকণ্ঠিত অবস্থায় মৃত ব্যক্তির ন্যায় আশ্রয় নিয়েছিলেন, আর দ্বিতীয়ত সেই কবর যা মদীনায় সর্বশ্রেষ্ঠ মানব (সা.)-এর কবরের সাথে সন্নিবেশিত। তাই আবু বকরের মর্যাদাকে অনুধাবন করো, যদি তুমি চিন্তাশীল হয়ে থাক। আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে তাঁর এবং তাঁর খিলাফতের সত্যায়ন করেছেন আর সর্বোত্তম ভাষায় তাঁর প্রশংসা করেছেন। তিনি (আ.) বলেন, নিঃসন্দেহে তিনি আল্লাহ্ তা'লার কাছে গ্রহণীয় ও প্রিয়ভাজন আর তাঁর সম্মান ও মর্যাদাকে কোনো উন্মাদ ছাড়া অন্য কেউ অসম্মান করতে পারে না। তাঁর খিলাফতের মাধ্যমে ইসলামের ওপর থেকে সকল বিপদাপদ দূর হয়ে গেছে। তিনি (আ.) বলেন, অপরদিকে তাঁর মহানুভবতায় মুসলমানদের সৌভাগ্য পরম মার্গে উপনীত হয়েছে। সৃষ্টির সেরা (সা.)-এর সাথে যদি আবু বকর না থাকতেন তাহলে ইসলামের ভিত্তি নিশ্চিহ্ন হওয়ার উপক্রম ছিল। তিনি ইসলামকে এক দুর্বল ও অসহায় এবং ক্ষীণকায় ও জীর্ণ পক্ষাঘাতগ্রস্ত ব্যক্তির ন্যায় পেয়ে নিজে অভিজ্ঞদের ন্যায় এর উজ্জ্বলতা ও সতেজতাকে পুনরায় ফিরিয়ে আনার জন্য উঠে দাঁড়ান এবং এক লুণ্ঠিত ব্যক্তির ন্যায় নিজের হারানো জিনিসের খোঁজে মগ্ন হয়ে যান। এমনকি ইসলাম নিজের সংগতিপূর্ণ উচ্চতা থেকে নিজ কোমল চেহারা ও সৌন্দর্যের সতেজতা আর স্বচ্ছ পানির সুমিষ্টতার দিকে ফিরে এসেছে, আর এসবই সেই বিশ্বস্ত বান্দার নিষ্ঠার কারণে (সম্ভব) হয়েছে। তিনি নিজ আত্মাকে মাটির সাথে মিশিয়েছেন আর অবস্থার পরিবর্তন করেছেন এবং রহমান খোদার সন্তুষ্টি ব্যতিরেকে অন্য কোনো প্রতিদানের প্রার্থী হন নি। অধিকন্তু এ অবস্থাতেই তাঁর দিন ও রাত কেটেছে। তিনি পঁচা হাড়ে প্রাণ সঞ্চারকারী, বিপদাপদ দূরকারী আর মরুভূমিতে মিষ্টি ফলের গাছগুলোর রক্ষক ছিলেন। তিনি খাঁটি ঐশী সাহায্য লাভ করেছেন আর এটি আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ ও কৃপার কারণে হয়েছে। এখন আমরা এক খোদার ওপর ভরসা করে কিছু সাক্ষ্যের উল্লেখ করছি যেন তোমার কাছে এই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, কীভাবে তিনি প্রবল ঝড়ের (ন্যায়) নৈরাজ্য ও ঝলসে দেয় এমন আগুনের বিপদাপদকে নির্মূল করেছেন আর কীভাবে তিনি যুদ্ধে বড় বড় দক্ষ বর্শা নিক্ষেপকারী ও অসিচালকদের ধ্বংস করেছেন। এভাবে তাঁর আভ্যন্তরীণ অবস্থা তাঁর কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে গেছে আর তাঁর আমল তাঁর প্রশংসনীয় গুণাবলীর সত্যতার সাক্ষ্য সাক্ষ্য প্রদান করেছে। আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে সর্বোত্তম প্রতিদান দিন এবং তাঁর পুনরুত্থান যেন মুত্তাকীদের ইমাম রূপে হয় আর আল্লাহ্ তাঁর এই প্রিয়দের কল্যাণে আমাদের প্রতি কৃপা করুন। হে আশিস ও অনুগ্রহের মালিক খোদা! আমার দোয়া গ্রহণ করো। তুমি সর্বাধিক দয়ালু এবং দয়ালুদের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ।

তিনি (আ.) আরো বলেন, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)'র আদর্শ সর্বদা নিজের সামনে রাখো। মহানবী (সা.)-এর সেই যুগের প্রতি লক্ষ্য করো, কুরাইশের শত্রুরা যখন সকল দিক হতে অনিষ্ট করতে উদ্যত ছিল এবং তারা তাঁকে (সা.) হত্যার ষড়যন্ত্র করে, সেই যুগ মহা পরীক্ষার যুগ ছিল। তখন হযরত আবু বকর (রা.) বন্ধুত্বের যে দায়িত্ব পালন করেছেন তার দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে দেখা যায় না। এ শক্তি ও বল সততা ও ঈমান ছাড়া লাভ করা মোটেই সম্ভব নয়। আজ তোমরা যতজন (এখানে) বসে আছো, স্ব স্ব স্থান থেকে একটু চিন্তা করে দেখো যে, এ ধরনের কোনো পরীক্ষা যদি আমাদের ওপর এসে পড়ে তাহলে কতজন রয়েছে যারা সঙ্গ দিতে প্রস্তুত? উদাহরণস্বরূপ, সরকারের পক্ষ থেকেই যদি তদন্ত শুরু করা হয় যে, কোন্ কোন্ ব্যক্তি কার হাতে বয়আত করেছে, তাহলে কয়জন আছে যারা বীরত্বের সাথে এ

কথা বলবে যে, আমরা বয়আত গ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত? আমি জানি, একথা শুনে কতকের হাত পা অবশ হয়ে যাবে আর তাৎক্ষণিকভাবে নিজেদের সহায়সম্পত্তি ও আত্মীয়স্বজনের কথা তাদের মনে পড়বে যে, তাদের সবাইকে পরিত্যাগ করতে হবে।

তিনি (আ.) বলেন, বিপদাপদের সময় সঙ্গ দেয়াই সর্বদা পরিপূর্ণ ঈমানদার লোকের কাজ হয়ে থাকে। এ জন্য ঈমানকে যতক্ষণ মানুষ কার্যত নিজের মাঝে ধারণ না করবে, কেবল মৌখিক দাবিতে কিছু হয় না আর ছলচাতুরীও ততক্ষণ পর্যন্ত দূরীভূত হয় না। কার্যত যখন বিপদাপদের সময় আসে তখন অল্প সংখক লোকই অবিচল থাকে। হযরত ঈসা (আ.)-এর শিষ্যরা শেষ সময়ে, যা তাঁর (আ.) বিপদের সময় ছিল, তাঁকে (আ.) নিঃসঙ্গ রেখে পালিয়ে যায় আর কতিপয় তো তাঁর সামনেই তাঁর প্রতি অভিসম্পাত করে।

আবার তিনি (আ.) বলেন, মোটকথা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)'র সততা সেই বিপদের সময় প্রকাশ পায় যখন মহানবী (সা.)-কে অবরুদ্ধ করা হয়েছিল। যদিও কতিপয় কাফেরের মত ছিল তাঁকে (সা.) দেশান্তর করা, কিন্তু আসল উদ্দেশ্য ও সিদ্ধান্ত ছিল তাঁকে (সা.) হত্যা করা। এমন সময়ে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) তাঁর সততা ও নিষ্ঠার সেই আদর্শ প্রদর্শন করেন যা অনন্তকাল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। উক্ত বিপদের সময় মহানবী (সা.)-এর এই মনোনয়নই হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)'র সততা এবং চরম বিশ্বস্ততার এক শক্তিশালী প্রমাণ। দেখো! ভারতের ভাইসরয় তথা রাজার গভর্নর যদি কোনো ব্যক্তিকে কোনো বিশেষ কাজের জন্য নির্বাচন করে, তবে তার মতামত সঠিক ও উত্তম হবে, নাকি এক চৌকিদারের (মতামত)? অর্থাৎ ভাইসরয় নির্বাচন করলে তার মতামত সঠিক হবে নাকি এক সাধারণ চৌকিদারের (মতামত)? তিনি (আ.) বলেন, মানতে হবে যে, গর্ভনরের নির্বাচন অবশ্যই উপযুক্ত ও যথার্থ হবে, কেননা যখন সরকারের পক্ষ হতে তাকে সরকারের নায়েব বা সহকারী হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে এবং তার বিশ্বস্ততা, বিচক্ষণতা এবং অভিজ্ঞতার ওপর সরকার ভরসা করেছে বলেই তো সরকার চালানোর দায়িত্ব তার হাতে অর্পণ করা হয়েছে। তথাপি তার সঠিক পরামর্শ ও পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানকে উপেক্ষা করে এক চৌকিদারের নির্বাচন ও মতামতকে সঠিক জ্ঞান করা সমীচীন নয়। মহানবী (সা.)-এর নির্বাচনের বিষয়টিও এমনই ছিল। তখন তাঁর (সা.) কাছে সত্তর-আশি জন সাহাবী বর্তমান ছিলেন। যাদের মাঝে হযরত আলী (রা.)-ও ছিলেন। কিন্তু তথাপি তাদের সবার মধ্য থেকে নিজের সঙ্গ দেয়ার জন্য তিনি (সা.) হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-কেই নির্বাচন করেন। এতে কী রহস্য অন্তর্হিত আছে? আসল কথা হলো, নবী খোদা তা'লার দৃষ্টিতে দেখে থাকেন এবং তাঁর জ্ঞান আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকেই আসে। এজন্য আল্লাহ্ তা'লাই মহানবী (সা.)-কে দিব্যদর্শন এবং এলহামের মাধ্যমে বলে দিয়েছেন, একাজের জন্য হযরত আবু বকর (রা.)-ই সবচেয়ে উত্তম এবং উপযুক্ত। হযরত আবু বকর (রা.) সেই কঠিন সময়ে মহানবী (সা.)-এর সঙ্গী হয়েছেন, এটি খুবই ভয়ানক পরীক্ষার সময় ছিল।

তিনি (আ.) বলেন, মোটকথা হযরত আবু বকর (রা.) তাঁকে পূর্ণ সঙ্গ দিয়েছেন এবং সওর গুহা নামের একটি গুহায় গিয়ে তাঁরা আত্মগোপন করেন। দুষ্ট কাফেররা যারা মহানবী (সা.)-কে কষ্ট দেয়ার পূর্ণ ছক কষে রেখেছিল, সন্ধান করতে করতে অবশেষে এই গুহা পর্যন্ত পৌঁছে যায়। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) নিবেদন করেন, এখন তো এরা একেবারে নাকের ডগায় এসে গেছে এদের কেউ যদি সামান্য নিচের দিকে তাকায় তাহলে সে দেখে ফেলবে আর আমরা ধরা পড়ে যাব। তখন মহানবী (সা.) বলেন, **লা তাহযান ইন্নাল্লাহা**

মা'আনা– দুঃখ করো না, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সাথে আছেন। এই শব্দে গভীরভাবে প্রণিধান কর, এতে মহানবী (সা.) হযরত আবু বকর (রা.)-কে নিজের সাথে সম্পৃক্ত করে নিয়েছেন। যেমন তিনি বলেন, **ইন্নাল্লাহা মা'আনা**, এখানে **'মা'আনা'**-তে তাঁরা উভয়েই অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা তোমার ও আমার উভয়ের সাথে আছেন। আল্লাহ তা'লা এক পাল্লায় মহানবী (সা.)-কে রেখেছেন আর অপর পাল্লায় হযরত আবু বকর (রা.)-কে রেখেছেন। [দাড়িপাল্লার দুটি পাল্লা থাকে; একটিতে মহানবী (সা.)-কে রেখেছেন আর অপরটিতে হযরত আবু বকর (রা.)কে রেখেছেন।] এখন উভয়ই বিপদসঙ্কুল পরিস্থিতিতে নিপতিত, কেননা এটি সেই স্থান যেখান থেকে হয় ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত হবে, নতুবা ধ্বংস হয়ে যাবে। শত্রু গুহার মুখে দাঁড়ানো আর বিভিন্ন ধরনের মতামত ব্যক্ত করছে। কেউ বলছে, এই গুহার তল্লাশি করো, কেননা পদচিহ এখানে এসেই শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু তাদের কেউ কেউ বলে, এখানে কোনো মানুষ কীভাবে যেতে পারে অথবা প্রবেশ করতে পারে? মাকড়সা জাল বুনে রেখেছে, কবুতর ডিম পেড়ে রেখেছে! এমনই আরো অনেক কথা ভেতর থেকে শোনা যাচ্ছিল আর তিনি খুবই স্পষ্টভাবে এসব কথা শুনছিলেন। এমন অবস্থায় শত্রুরা [মহানবী (সা.)-কে] হত্যা করার উদ্দেশ্যে উন্মাদের ন্যায় এসেছে। কিন্তু মহানবী (সা.)-এর উন্নত মর্যাদা দেখো! শত্রু নাকের ডগায় আর তিনি (সা.) তাঁর প্রিয় বন্ধুকে বলছেন, **লা তাহযান ইন্নাল্লাহা মা'আনা**। এই বাক্যটি খুব ভালোভাবে প্রকাশ করে যে, তিনি (সা.) একথা মুখেই বলেছেন, কেননা এটি সশব্দে বলার দাবি রাখে; ইঙ্গিতে (একথা) বলা যায় না। বাইরে শত্রুরা সলাপরামর্শ করছে, কিন্তু গুহার ভেতরে ভৃত্য ও মনিবও কথোপকথনে ব্যস্ত। শত্রু কথার আওয়াজ শুনে ফেলতে পারে– এর প্রতি ভ্রূক্ষেপ করা হয় নি। এটিই হলো আল্লাহ্ তা'লার প্রতি পূর্ণ ঈমান ও তত্ত্বজ্ঞানের প্রমাণ এবং খোদা তা'লার প্রতিশ্রুতির প্রতি পূর্ণ আস্থা। মহানবী (সা.)-এর বীরত্বের জন্য এ দৃষ্টান্তই যথেষ্ট। হযরত আবু বকর (রা.)'র বীরত্বের জন্য এটি ছাড়াও আরেকটি সাক্ষ্য রয়েছে।

তিনি (আ.) বলেন, মহানবী (সা.) যখন ইহধাম ত্যাগ করেন এবং হযরত উমর (রা.) তরবারি উঁচু করে বেরিয়ে পড়েন আর বলেন, যে-ই বলবে মহানবী (সা.) ইন্তেকাল করেছেন তাকে আমি হত্যা করব। এহেন পরিস্থিতে হযরত আবু বকর (রা.) খুব বীরত্ব ও সাহসিকতার সাথে কথা বলেন এবং দাঁড়িয়ে ভাষণ দেন, مَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ, অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা.)-ও আল্লাহ্‌র রসূলই ছিলেন আর তাঁর পূর্বে যত নবী এসেছিলেন তারা সবাই ইন্তেকাল করেছেন। একথা শুনে তাঁর উত্তেজনা প্রশমিত হয়। এরপর আরবের বেদুইনরা মুরতাদ হয়ে যায়। এমনই স্পর্শকাতর সময়ের চিত্র হযরত আয়েশা (রা.) এভাবে অঙ্কন করেছেন যে, আল্লাহ্‌র নবী (সা.)-এর ইন্তেকাল হয়ে যায় আর এদিকে কতিপয় নবুয়্যতের মিথ্যা দাবিদার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। কিছু লোক নামায পরিত্যাগ করে এবং পরিস্থিতি পাল্টে যায়। এরূপ পরিস্থিতিতে এবং এমন সংকটের সময় আমার পিতা মহানবী (স.)-এর খলীফা এবং স্থলাভিষিক্ত হন। আমার পিতা এমন সব উৎকণ্ঠার সম্মুখীন হন যা পাহাড়ের ওপর পতিত হলে পাহাড়ও ধ্বংস হয়ে যেত। এখন ভেবে দেখো! বিপদাপদের পাহাড় ভেঙ্গে পড়া সত্ত্বেও সাহস ও মনোবল না হারানো কোনো সাধারণ মানুষের কাজ নয়। এ অবিচলতা 'সিদ্‌ক' তথা সততা ও বিশ্বস্ততা বৈশিষ্ট্যেরই মুখাপেক্ষী এবং সিদ্দীকই এ (দৃষ্টান্ত)টি প্রদর্শন করেছেন। এই সংকটাপন্ন পরিস্থিতিকে সামলানো অন্য কারো পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। সব সাহাবী তখন বিদ্যমান ছিলেন। কেউ বলে নি, এটি আমার অধিকার। তারা দেখছিলেন,

আগুন লেগে গেছে; এই আগুনে কে ঝাঁপ দেবে? হযরত উমর (রা.) এ পরিস্থিতিতে হাত বাড়িয়ে তাঁর হাতে বয়আত করেন। এরপর সবাই একের পর এক বয়আত করে। তাঁর সততা ও নিষ্ঠাই ছিল যা সেই নৈরাজ্যের অবসান ঘটিয়েছে এবং সেসব নৈরাজ্যবাদীকে ধ্বংস করেছে। মুসায়লামার সাথে এক লক্ষ লোক ছিল এবং তাদের বিষয়টি হালাল ও হারাম না মানার বিষয় ছিল; তার হালাল ও হারামকে তুচ্ছজ্ঞানকারী বিষয়গুলো দেখে লোকেরা তার মতাদর্শে যুক্ত হতে থাকে। কিন্তু খোদা তা'লা তাঁর (রা.) সাথে থাকার প্রমাণ দিয়েছেন এবং সকল বিপদাপদকে সহজ করে দিয়েছেন।

পুনরায় তিনি (আ.) বলেন, আমি জানি, কোনো ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন ও মুসলমান হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত (তার মাঝে) আবু বকর, উমর, উসমান ও আলী (রা.)'র ন্যায় বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি না হবে। তাঁরা দুনিয়াকে ভালোবাসতেন না, বরং নিজেদের জীবনকে তাঁরা খোদা তা'লার পথে উৎসর্গ করে রেখেছিলেন।

তিনি (আ.) আরো বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! সিদ্দীকে আকবর খোদার সেই বীরপুরুষ যাকে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে বিশেষত্বের অনেক পোশাক দান করা হয়েছে। [অর্থাৎ অনেক বৈশিষ্ট্য দান করা হয়েছে।] আল্লাহ্ তাঁর পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছেন, তিনি বিশেষ পুণ্যবান লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তাঁকে সঙ্গ দেয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি তাঁর প্রশংসা করেছেন, তাঁকে মূল্যায়ন করে তাঁর গুণগান গেয়েছেন এবং তাঁর প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছেন, তিনি এমন এক ব্যক্তি ছিলেন যিনি অন্য সব নিকটাত্মীয়কে পরিত্যাগ করা পছন্দ করেছেন, কিন্তু প্রিয় নবী (সা.)-এর সাথে বিচ্ছেদ তাঁর জন্য অসহ্য ছিল। তিনি নিজ মনিবকে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং তাঁর কাছে ছুটে এসেছেন। পরম আগ্রহের সাথে তিনি নিজেকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছেন এবং হৃদয়ের সব কামনা বাসনাকে নিজ পথ থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছেন। রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁকে সঙ্গ দেয়ার জন্য ডাকলে তিনি 'লাব্বায়েক' বলে উঠে দাঁড়িয়েছেন। আবার জাতি যখন মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.)-কে বহিষ্কারের ষড়যন্ত্র করে তখন মহা প্রতাপান্বিত খোদার প্রিয় নবী (সা.) তাঁর কাছে গিয়ে বলেন, আমাকে হিজরতের নির্দেশ দেয়া হয়েছে; তুমিও আমার সাথে হিজরত করবে আর আমরা একসাথে এই জনপদ থেকে বের হব। অতএব একথা শুনে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) আলহামদুলিল্লাহ্ পড়েন, কেননা এমন সংকটময় অবস্থায় তিনি মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.)-এর সফরসঙ্গী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। তিনি শুরু থেকেই নির্যাতিত নবী (সা.)-কে সাহায্য করার সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। এক পর্যায়ে সেই সুযোগ চলে আসে আর তখন তিনি এই চরম উৎকণ্ঠা ও বিপদের সময় পরম আন্তরিকতা ও এক দুর্বার উন্মাদনার সাথে মহানবী (সা.)-এর সঙ্গ দিয়েছেন এবং হত্যাকারীদের হত্যার ষড়যন্ত্রে ভীত হন নি।

অতএব সুস্পষ্ট নির্দেশ ও সুদৃঢ় কুরআনের আয়াতের আলোকে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত। তাঁর সাধু হওয়া অকাট্য দলিল দ্বারা সাব্যস্ত এবং তাঁর সততা ও নিষ্ঠা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট। তিনি পরকালের নেয়ামত পছন্দ করেছেন এবং পার্থিব চাকচিক্য ও ভোগবিলাসকে পরিত্যাগ করেছেন। অন্য কেউই তাঁর এই শ্রেষ্ঠত্বে উপনীত হতে পারে না।

তিনি (আ.) বলেন, তুমি যদি প্রশ্ন কর, আল্লাহ্ খিলাফতের ধারা সূচিত করার জন্য তাঁকে কেন বেছে নিলেন? অতিশয় দয়ালু খোদার এহেন কাজের পেছনে রহস্যই বা কী ছিল? এ প্রশ্নের উত্তর হলো, আল্লাহ্ তা'লা জানতেন, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (আল্লাহ্ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন এবং তাঁকেও নিজ সন্তুষ্টির ছায়ায় রাখুন) এক অমুসলিম জাতির মধ্য থেকে

মহানবী (সা.)-এর প্রতি সম্পূর্ণরূপে সমর্পিত হৃদয় নিয়ে তখন ঈমান এনেছেন যখন তিনি (সা.) একেবারেই একা ছিলেন আর চারিদিকে চরম নৈরাজ্য বিরাজ করছিল। ঈমান আনার পর তিনি বিভিন্ন ধরনের লাঞ্ছনা, গঞ্জনা সয়েছেন। স্বজাতি, আত্মীয়স্বজন, নিজ গোষ্ঠি ও আপন-পর সবার পক্ষ থেকে তিনি অভিসম্পাত ও তির্যক কথাবার্তা সয়েছেন। রহমান খোদার পথে তাঁকে কষ্ট দেয়া হয়েছে। যেভাবে জিন ও মানবের নবী বহিষ্কৃত হয়েছেন সেভাবে তিনিও স্বদেশ থেকে বহিষ্কৃত হন। শত্রুর পক্ষ থেকে অনেক কষ্ট এবং বন্ধুদের পক্ষ থেকে তিনি অনেক অভিসম্পাত ও সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছেন। তিনি (রা.) নিজের সম্পদ ও জীবন বাজি রেখে মহাসম্মানিত প্রভুর পথে জিহাদ করেছেন। তিনি আভিজাত্য ও প্রাচুর্যের মাঝে লালিতপালিত হওয়া সত্ত্বেও সাধরাণ লোকের মতো জীবনযাপন করেছেন। খোদার খাতিরে তিনি বহিষ্কৃত হন এবং খোদার পথে তাঁকে দুঃখ দেয়া হয়। তিনি আল্লাহ্‌র পথে নিজ সম্পদ দিয়ে জিহাদ করেছেন। ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্য লাভের পর তিনি গরীব ও নিঃস্ব ব্যক্তির মত হয়ে যান। তাঁর অতীত দিনগুলোর প্রতিদান দিতে এবং তাঁর যে ক্ষতি হয়েছে এর তুলনায় উত্তম দানে ভূষিত করতে আর খোদার সন্তুষ্টির সন্ধানে তিনি যে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন তার জন্য আল্লাহ্‌ তাঁকে পুরস্কৃত করার সিদ্ধান্ত নেন। আল্লাহ্‌ পুণ্যবান মানুষের প্রতিদানকে কখনোই বিনষ্ট করেন না। তাঁর প্রভু তাঁকে খলীফা মনোনীত করেন, তাঁর জন্য তাঁর নামকে সমুন্নত করেন এবং তাঁর মনস্তুষ্টি করেন। এছাড়া নিজ কৃপা ও দয়ায় তিনি তাঁকে সম্মানিত করেন এবং তাঁকে আমীরুল মু'মিনীন নিযুক্ত করেন।

হযরত মসীহ্‌ মওউদ (আ.) আরো বলেন, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.), হযরত উমর ফারুক (রা.), হযরত যুন্নুরাইন তথা উসমান (রা.) এবং হযরত আলী মর্তুজা (রা.) এঁরা সবাই আসলে ধর্মের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন– এই দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করা একান্ত আবশ্যক। ইসলামের দ্বিতীয় আদম হযরত আবু বকর (রা.) আর অনুরূপভাবে হযরত উমর ফারুক এবং হযরত উসমান (রা.) যদি সত্যিকার অর্থেই ধর্মের ক্ষেত্রে বিশ্বস্ত না হতেন তাহলে আজ আমাদের জন্য পবিত্র কুরআনের কোনো একটি আয়াতকেও আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে (একথা) বলাটা কঠিন ছিল।

পুনরায় হযরত মসীহ্‌ মওউদ (আ.) বলেন, হযরত আবু বকর (রা.) ইসলামের দ্বিতীয় আদম। সেই যুগেও মুসায়লামা অবৈধ উদ্দেশ্যে লোকদেরকে একত্রিত করে রেখেছিল। এমন সময় হযরত আবু বকর (রা.) খলীফা মনোনীত হন। অতএব মানুষ অনুভব করতে পারে, কীরূপ কঠিন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়ে থাকবে। তিনি যদি দৃঢ়চিত্ত না হতেন এবং মহানবী (সা.)-এর ঈমানী রং যদি তাঁর ঈমানে না থাকত তাহলে খুবই কঠিন হতো আর তিনি ঘাবড়ে যেতেন। কিন্তু আবু বকর সিদ্দীক (রা.) মহানবী (সা.)-এর প্রতিচ্ছবি ছিলেন। [প্রতিচ্ছবি, অর্থাৎ যেভাবে মহানবী (সা.)-এর ছায়া ছিল তিনিও তেমনই ছিলেন।] তাঁর ওপর মহানবী (সা.)-এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রভাব বিস্তার লাভ করেছিল আর তাঁর হৃদয় দৃঢ় বিশ্বাসের জ্যোতিতে পরিপূর্ণ ছিল। এজন্যই তিনি সেই সাহসিকতা ও দৃঢ়তা প্রদর্শন করেছেন যার দৃষ্টান্ত মহানবী (সা.)-এর পর খুঁজে পাওয়া ভার। তাঁর (রা.) জীবনের ওপরই ইসলামের জীবন নির্ভর করছিল। এটি এমন একটি বিষয় যে সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনার কোনো প্রয়োজনই নেই। সেই যুগের অবস্থা সম্পর্কে পড়ে দেখ আর এরপর হযরত আবু বকর (রা.) ইসলামের যে সেবা করেছেন তা অনুমান করে দেখ। আমি সত্যি করে বলছি, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) ইসলামের জন্য দ্বিতীয় আদম ছিলেন। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে,

মহানবী (সা.)-এর পর যদি আবু বকর (রা.)'র সত্তা না থাকত তাহলে ইসলামও থাকত না। আবু বকর সিদ্দীক (রা.)'র অনেক বড় অনুগ্রহ হলো, তিনি ইসলামকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। নিজ ঈমানী শক্তিবলে তিনি সমস্ত বিদ্রোহীকে শাস্তি দিয়েছেন এবং শান্তি স্থাপন করেছেন। যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন এবং প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, আমি সত্য খলীফার মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠা করব সেভাবেই এই ভবিষ্যদ্বাণী হযরত সিদ্দীকের খিলাফতের মাধ্যমে পূর্ণ হয়েছে আর স্বর্গ ও মর্ত্য কার্যত এর সাক্ষ্য প্রদান করেছে। এই হলো সিদ্দীকের সংজ্ঞা, অর্থাৎ তার মাঝে এমন উচ্চ মান ও উৎকৃষ্ট পর্যায়ের সততা হওয়া উচিত যার দৃষ্টান্ত উপস্থাপনে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান শিঘ্রই হয়ে যায়।

এরপর তিনি (আ.) বলেন, মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর পর হাজার হাজার মানুষ মুরতাদ হয়ে যায়, যদিও তাঁর (সা.) যুগেই শরীয়ত পূর্ণতা লাভ করেছিল। তখন এই ধর্মত্যাগের বিষয়টি এতদূর গড়ায় যে, কেবল এমন দুটি মসজিদ অবশিষ্ট ছিল যেখানে নামায পড়া হতো; অন্য আর কোনো মসজিদেই নামায পড়া হতো না। এরাই সে সমস্ত লোক যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা হযরত আবু বকরের মাধ্যমে পুনরায় ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করেন আর (এভাবে) তিনি দ্বিতীয় আদম হয়েছেন। আমার দৃষ্টিতে মহানবী (সা.)-এর পর এই উম্মতের প্রতি অনেক বড় অনুগ্রহ করেছেন হযরত আবু বকর (রা.)। কেননা তাঁর যুগেই চারজন মিথ্যা নবুয়্যতের দাবিদার মাথাচাড়া দিয়েছিল। মুসায়লামার সাথে এক লক্ষ মানুষ একত্রিত হয়ে গিয়েছিল আর তাদের নবী তাদের কাছ থেকে চিরবিদায় নিয়েছিলেন, কিন্তু এমন বিপদের সময়ও ইসলাম নিজ অবস্থানে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। হযরত উমর (রা.) তো সবকিছু প্রস্তুতকৃতই পেয়েছিলেন আর এরপর তিনি এর প্রসার ঘটাতে থাকেন। এভাবে ইসলাম আরবের সীমানা পেরিয়ে সিরিয়া ও রোম পর্যন্ত পৌঁছে যায় আর এসব দেশ মুসলমানদের দখলে চলে আসে। অন্য কেউই হযরত আবু বকর (রা.)'র ন্যায় বিপদের সম্মুখীন হন নি; হযরত উমর, হযরত উসমান এবং হযরত আলী (রা.)-ও না।

তিনি (আ.) আরো বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে লাঞ্ছিত হবে সে-ই পরিশেষে সম্মান ও প্রতাপের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হবে। আবু বকরকেই দেখ! লাঞ্ছনাকে যিনি সর্বপ্রথম মাথা পেতে নিয়েছেন তিনিই সর্বাগ্রে (খিলাফতের) আসনে সমাসীন হয়েছেন।

তিনি (আ.) বলেন, পৃথিবীতে এমন ভুরি ভুরি উদাহারণ ও দৃষ্টান্ত রয়েছে যে, যারা আল্লাহ্‌র পথে প্রাণ দিয়েছে ও নিহত হয়েছে, তাদের জীবিত ও অমর হওয়ার প্রমাণ পৃথিবীর অণু-পরমাণুতে বিদ্যমান। হযরত আবু বকর (রা.)-কেই দেখ! আল্লাহ্‌র পথে তিনি সবচেয়ে বেশি উজাড় করে দিয়েছেন, বিনিময়ে তাঁকে দেয়াও হয়েছে সবচেয়ে বেশি। ফলে ইসলামের ইতিহাসে প্রথম খলীফা আবু বকর (রা.)-ই হয়েছেন।

তিনি (আ.) বলেন, অনেকে এ ধারণাও করে থাকতে পারে যে, আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে জগতকে পরিত্যাগ করে আমরা কি নিজেদের ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেব? কিন্তু এটি তাদের আত্মপ্রবঞ্চনা। বাস্তবে কেউ ধ্বংস হবে না। হযরত আবু বকর (রা.)-কেই দেখ; তিনি সব কিছু পরিত্যাগ করেছেন, বিনিময়ে তিনি সর্বপ্রথম সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন।

পুনরায় তিনি (আ.) বলেন, তোমাদের কাছে এ দলিলটি সুস্পষ্ট করার জন্য বিস্তারিত বিবরণের যে সম্পর্ক রয়েছে তা হলো, হে বুদ্ধিমান ও পুণ্যবান লোকেরা জেনে রাখ! আল্লাহ্ তা'লা সমস্ত মুসলমান পুরুষ ও নারীর সাথে এসব আয়াতে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে,

তিনি তাঁর কৃপা ও দয়ায় তাদের মধ্যে থেকে মু'মিনদেরকে অবশ্যই খলীফা মনোনীত করবেন। [আয়াতে ইস্তেখলাফ তথা খিলাফত সংক্রান্ত আয়াত সম্পর্কে তিনি (আ.) একথা বলছেন।] এছাড়া তাদের ভয়ভীতির অবস্থাকে অবশ্যই শান্তিতে পরিবর্তন করে দেবেন। এ বিষয়ের পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গীন প্রমাণ হিসেবে আমরা হযরত আবু বকর (রা.)'র খেলাফতকেই দেখতে পাই। কেননা গবেষকদের কাছে এ বিষয়টি যেভাবে গুপ্ত নয় যে, তাঁর খেলাফতকাল ভয়ভীতি ও বিপদাপদের সময় ছিল, তাই মহানবী (সা.) যখন ইন্তেকাল করেন তখন ইসলাম ও মুসলমানদের ওপর বিপদাপদের পাহাড় ভেঙে পড়ে। তিনি (আ.) বলেন, অনেক মুনাফেক মুরতাদ হয়ে যায় এবং মুরতাদদের জিহ্বাও লম্বা হয়ে যায় আর মিথ্যাবাদীরা নবুয়্যতের দাবি করে বসে এবং অধিকাংশ বেদুইন গিয়ে তাদের দলে যোগ দেয়। এভাবে মুসায়লামা কায্যাবের সাথে প্রায় এক লক্ষ অজ্ঞ ও দুরাচারী লোক যুক্ত হয়। নৈরাজ্য ফুঁসে ওঠে, সমস্যাদি বৃদ্ধি পায়, বিপদাপদ দূর ও কাছের সবকিছুকেই পরিবেষ্টন করে নেয় এবং মু'মিনদের ওপর এক চরম অস্থিরতা ছেয়ে যায়। সে সময় প্রত্যেক ব্যক্তি পরীক্ষার সম্মুখীন হয় আর ভয়ঙ্কর ও কাণ্ডজ্ঞান লোপকারী অবস্থা দেখা দেয়। মু'মিনরা এতটা নিরুপায় ছিল যেন তাঁদের অন্তরে আগুন জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে অথবা তাদেরকে যেন ছুরি দিয়ে জবাই করা হয়েছে। কখনো তারা সর্বশ্রেষ্ঠ মানব মুহাম্মদ (সা.)-এর বিরহে আবার কখনো সেই অরাজকতার কারণে অশ্রু বিসর্জন দিচ্ছিল যা ভস্মকারী অগ্নিরূপে প্রকাশ পেয়েছিল। শান্তির কোনো নামগন্ধও ছিল না। নৈরাজ্যবাদীরা ময়লার স্তূপে গজিয়ে ওঠা ঘাসের মত সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। মু'মিনদের ভয়ভীতি ও আতঙ্ক অনেক বেড়ে গিয়েছিল আর (তাদের) হৃদয় ত্রাস ও অস্থিরতায় পরিপূর্ণ ছিল। এমন স্পর্শকাতর মুহূর্তে হযরত আবু বকর (রা.)-কে যুগের হাকেম এবং খাতামান্নাবীঈন (সা.)-এর খলীফা মনোনীত করা হয়। মুনাফেক, কাফের ও মুরতাদদের চালচলন ও রীতিনীতি দেখে তিনি (রা.) দুঃখের সাগরে ডুবে যেতেন। শ্রাবণের বারিধারার ন্যায় তিনি (রা.) বিরামহীনভাবে কাঁদতেন আর তাঁর অশ্রুধারা প্রবাহমান ঝরনার মত বইতে থাকত এবং তিনি (রা.) ইসলাম ও মুসলমানদের মঙ্গলের জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে মিনতি করতেন। এভাবে খোদার সাহায্য এসে যায় এবং মিথ্যা নবীদের হত্যা আর মুরতাদদের ধ্বংস করা হ য়। এছাড়ানৈরাজ্য দূরীভূত করা হয়, বিপদাপদ অপসৃত হয়, সমস্যার সমাধান হয়, খিলাফতের বিষয়টি সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় আর আল্লাহ্ মু'মিনদের বিপদাপদ থেকে রক্ষা করেন, তাদের ভয়ভীতির অবস্থাকে নিরাপত্তায় বদলে দেন এবং তাদের জন্য তাদের ধর্মকে দৃঢ়তা দান করেন, এক জগতকে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন, নৈরাজ্যবাদীদের মুখে কালিমা লেপে দেন, নিজ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেন, তাঁর বান্দা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-কে সাহায্য করেন, বিভিন্ন বিদ্রোহী নেতা ও প্রতিমা ধ্বংস করেন এবং কাফেরদের হৃদয়ে এমন ভীতির সঞ্চার করেন যে, তারা পশ্চাৎপদ হয়ে অবশেষে (কুফরী) পরিত্যাগ করে তওবা করে; আর এটিই ছিল কাহ্‌হার খোদার প্রতিশ্রুতি, আর তিনি সকল সত্যবাদীর তুলনায় সর্বাধিক সত্যবাদী। অতএব গভীরভাবে চিন্তা করে দেখো! হযরত আবু বকরের সত্তায় কত স্পষ্টভাবে খিলাফতের প্রতিশ্রুতি সমস্ত অনুষঙ্গ ও লক্ষণসহ পূর্ণ হয়েছে।

তিনি (আ.) আরো বলেন, গভীরভাবে চিন্তা করে দেখো! তাঁর খলীফা হওয়ার মুহূর্তে মুসলমানদের কী অবস্থা ছিল? বিপদাপদের দরুন ইসলাম অগ্নিদগ্ধ মানুষের ন্যায় নাজুক অবস্থায় ছিল। পুনরায় ইসলামকে আল্লাহ্ তা'লা এর শক্তি ফিরিয়ে দেন এবং গভীর কূপ

থেকে উদ্ধার করেন আর মিথ্যা নবুওয়্যতের দাবিদাররা ভয়ঙ্কর শাস্তি পেয়ে মারা পড়ে এবং মুরতাদদের চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় হত্যা করা হয়।

তিনি (আ.) বলেন, মু'মিনদেরকে তিনি সেই ভয়ভীতির অবস্থা থেকে (উদ্ধার করে) প্রশান্তি দান করেন যাতে তারা মৃতবৎ ছিল। এই কষ্ট দূর হবার পর মু'মিনরা আনন্দিত হতেন আর হযরত সিদ্দীক (রা.)-কে তাঁরা অভিনন্দন জানাতেন এবং তাঁকে প্রাণঢালা শুভেচ্ছা জানাতেন আর তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন। তারা তাঁকে এক পবিত্র সত্তা এবং নবীদের ন্যায় (ঐশী) সাহায্যপ্রাপ্ত জ্ঞান করতেন, আর এ সবই হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)'র সততা এবং দৃঢ় বিশ্বাসের দরুন ছিল।

পুনরায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) মহানবী (সা.)-এর তিরোধানের পর ইসলামের কী অবস্থা হয়েছিল আর এতে হযরত আবু বকর (রা.)'র ভূমিকার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন,

তিনি (রা.) নবী ছিলেন না ঠিকই, কিন্তু তাঁর মাঝে রসূলদের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিল। তাঁর (রা.) নিষ্ঠার কারণেই ইসলামের বাগানে এর প্রকৃত সৌন্দর্য ফিরে আসে আর তিরের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হবার পর পুনরায় এটি আড়ম্বরপূর্ণ ও সবুজশ্যামল হয়ে ওঠে এবং নানা ধরনের ফুলে ফুলে এটি সুশোভিত হয় আর এর ডালপালা মলিনতামুক্ত হয়ে যায়। অথচ ইতঃপূর্বে এর অবস্থা এমন এক শবদেহের ন্যায় হয়ে গিয়েছিল যার জন্য বিলাপ করা হয়েছে। এর অবস্থা দুর্ভিক্ষ কবলিতের ন্যায় ছিল, সমস্যায় জর্জরিতের ন্যায় ছিল এবং জবাইকৃত এমন এক পশুর মত ছিল যার মাংস টুকরো টুকরো করা হয়েছে। এর অবস্থা নানান দুঃখকষ্টে জর্জরিত ও গ্রীষ্মের প্রচণ্ড রোদে পোড়া এক মানুষের মত ছিল, আর এরপর আল্লাহ্ তা'লা একে সেই সমস্ত সমস্যা থেকে পরিত্রাণ দিয়েছেন এবং এই সকল বিপদ থেকে মুক্তি দিয়েছেন আর অসাধারণ বিস্ময়কর সব সাহায্য ও সহায়তার মাধ্যমে একে সমর্থন যুগিয়েছেন। এভাবে ইসলাম নিজ পরাজয় ও ধুলো মলিনতার পর রাজাবাদশাদের নেতা এবং সাধারণ মানুষের অভিভাবক হয়ে যায়। ফলে মুনাফেকদের মুখে তালা লেগে যায় আর মু'মিনদের মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তখন প্রতিটি মানুষই তাদের প্রতিপালকের প্রশংসা এবং আবু বকর (রা.)'র প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে।

তিনি (আ.) আরো বলেন, হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) ইসলামকে এমন একটি দেয়ালের মতো পেয়েছেন যা চরম দুরাচারীদের দুষ্কৃতির ফলে ধসে পড়ার উপক্রম ছিল, তখন আল্লাহ্ তা'লা তাঁর (রা.) হাতে একে এমন এক দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিণত করেন যার প্রাচীর লৌহ নির্মিত আর যাতে ক্রীতদাসের ন্যায় সেনাদল আছে। অতএব তুমি গভীরভাবে চিন্তা করে দেখ, এতে কি তোমার সন্দেহের অবকাশ আছে অথবা তুমি কি কোনো অন্য জাতিতে এমন দৃষ্টান্ত দেখাতে পার?

আবার তিনি (আ.) বলেন, তিনি (রা.) একজন পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞানী, সাধু, খুবই নম্র স্বভাবসম্পন্ন ও খুবই দয়ার্দ্র প্রকৃতির অধিকারী ছিলেন আর অত্যন্ত বিনয় ও দারিদ্র্যের বেশে জীবন অতিবাহিত করতেন। খুবই ক্ষমাশীল ও মার্জনাকারী এবং স্নেহভালোবাসা ও কৃপার মূর্ত প্রতীক ছিলেন। তাঁর ললাটের জ্যোতি দেখেই তাঁকে চেনা যেত। মহানবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.)-এর সাথে তাঁর গভীর সম্পর্ক ছিল। সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মহানবী (সা.)-এর আত্মার সাথে তাঁর আত্মা একাকার হয়ে গিয়েছিল। সেই জ্যোতিই তাঁকে ঢেকে রেখেছিল যা তাঁর মনিব ও নেতা এবং খোদার প্রেমাস্পদ মুহাম্মদ (সা.)-কে আচ্ছাদন করে রেখেছিল। তিনি

রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর জ্যোতির মনোহর ঔজ্জ্বল্য ও তাঁর মহান কল্যাণের আশ্রয়ে আশ্রিত ছিলেন। কুরআনের ব্যুৎপত্তি অর্জন এবং নবীনেতা, মানবতার গর্ব মহানবী (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসা পোষণের ক্ষেত্রে তিনি সব মানুষের মাঝে স্বতন্ত্র ছিলেন। তাঁর সামনে পারলৌকিক জীবনের স্বরূপ এবং ঐশী রহস্যাবলী উন্মোচিত হওয়ার পর তিনি সমস্ত জাগতিক বন্ধন ছিন্ন করে আর দৈহিক সম্পর্ক পরিত্যাগ করে স্বীয় প্রেমাস্পদের রঙে রঙিন হয়ে যান। এছাড়া শুধু একটি অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের খাতিরেই নিজের সব চাওয়াপাওয়াকে জলাঞ্জলি দেন এবং সকল প্রকার জাগতিক কলুষ থেকে পবিত্র হয়ে তাঁর আত্মা এক পরম সত্য ও এক-অদ্বিতীয় খোদার রঙে রঙিন হয়ে যান আর বিশ্ব-প্রতিপালকের সন্তুষ্টির সন্ধানে নিজেকে তিনি বিলীন করে দেন। সত্যিকারের ঐশী প্রেম যখন তাঁর সব শিরা-উপশিরা ও হৃদয়ের গভীরতম স্থান এবং অস্তিত্বের প্রতিটি কণায় স্থান করে নেয় আর তাঁর কথা ও কাজ এবং ওঠাবসায় তাঁর জ্যোতি প্রকাশিত হয় তখন তিনি 'সিদ্দীক' নামে ভূষিত হন আর সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা খোদার দরবার থেকে তাঁকে অনেক বেশি সতেজ ও গভীর জ্ঞান দান করা হয়। নিষ্ঠা ছিল তাঁর স্থায়ী বৈশিষ্ট্য ও একটি সহজাত বিষয় আর এরই ছাপ ও জ্যোতি তাঁর সব কথা, কাজ, ওঠাবসা এবং সব ইন্দ্রিয় ও শ্বাস-প্রশ্বাসে প্রকাশ পেত। আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিপালক খোদার পক্ষ থেকে তাঁকে নিয়ামতপ্রাপ্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। নবুয়্যতকে একটি গ্রন্থের সাথে তুলনা করলে তিনি ছিলেন সেই গ্রন্থের ক্ষুদ্র অনুলিপি। তিনি শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ও সাহসী লোকদের ইমাম ছিলেন এবং নবীদের গুণাবলীসম্পন্ন মনোনীত লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি (আ.) আরো বলেন, আমাদের একথাকে তুমি কোনো অতিরঞ্জন মনে করবে না আর একে তুমি পক্ষপাতমূলক আচরণ ও প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয় জ্ঞান করবে না এবং একে তুমি প্রেমের আতিশয্যও মনে করবে না, বরং এটি সেই বাস্তব সত্য যা আমার কাছে সম্মানিত প্রভুর পক্ষ থেকে প্রকাশ করা হয়েছে। এছাড়া জাগতিক উপায়-উপকরণের দিকে বেশি মনোযোগী না হয়ে সর্বাধিপতি খোদার প্রতি পূর্ণ ভরসা রাখাই ছিল তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। যাবতীয় আচার-আচরণ ও শিষ্টাচারের ক্ষেত্রে তিনি আমাদের রসূল ও মনিব (সা.)-এর ছায়াস্বরূপ ছিলেন। সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সাথে তাঁর এক চিরস্থায়ী সম্বন্ধ ছিল আর এ কারণেই তিনি (রা.) মহানবী (সা.)-এর কল্যাণে অতি অল্প সময়ে এমন সব আশিসে ভূষিত হয়েছেন যে, অন্যরা তা সুদীর্ঘ কালক্ষেপণ এবং সুদূর পথ পাড়ি দিয়েও লাভ করতে পারে নি। তুমি জেনে রাখো, কোনো ব্যক্তির সাথে সামঞ্জস্যের কারণেই কল্যাণরাজি লাভ হয়ে থাকে। নিখিল বিশ্বে আল্লাহ্‌র নিয়ম এভাবেই কাজ করছে। অতএব কাউকে যদি অনাদি-অনন্ত বন্টনকারী আল্লাহ্ ওলী ও সূফীদের সাথে বিন্দুমাত্র সামঞ্জস্য দান না করেন, তাহলে এটিই সেই বঞ্চনা যা মহান আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে দুর্ভাগ্য নামে অভিহিত। সেই ব্যক্তিই পরম ও চরম সৌভাগ্যবান যে খোদার বন্ধুর বিভিন্ন অভ্যাসকে আয়ত্ব করে, এমনকি সে প্রতিটি অক্ষর, প্রতিটি শব্দ এবং সব রীতিনীতিতে মহানবী (সা.)-এর সাথে সদৃশ্যপূর্ণ হয়ে যায়। দুর্ভাগা লোকেরা তো এই চরম উৎকর্ষের বিষয়টি বুঝতেই পারে না। যেভাবে একজন জন্মান্ধ রং ও অবয়ব দেখতে পায় না সেভাবে এক হতভাগার অদৃষ্টে তো খোদার ভীতি ও ত্রাসপূর্ণ বিভিন্ন নিদর্শন ছাড়া আর কিছুই জোটে না। কেননা তার প্রকৃতি রহমতের নিদর্শন দেখার যোগ্যতা রাখে না এবং ঐশী প্রেম ও আকর্ষণের সৌরভ নিতে পারে না। নিষ্ঠা, শুভাকাঙ্ক্ষা, ভালোবাসা ও হৃদয়ের বিশালতা কাকে বলে তা সে জানেই না, কেননা প্রকৃতিগতভাবেই সে রাশি রাশি অন্ধকারে ভরা; [অর্থাৎ যে অন্ধ;] তার ওপর কল্যাণরাজির জ্যোতি কীভাবে অবতীর্ণ হবে? বরং দুর্ভাগার প্রবৃত্তি তো

প্রবল ঝড়ের তরঙ্গের ন্যায় তরঙ্গায়িত হয় আর তার আবেগ অনুভূতি তাকে সত্য ও বাস্তবতা দেখা থেকে তাকে বিরত রাখে। এজন্য সে সৌভাগ্যবান লোকদের ন্যায় তত্ত্বজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট হয় না। [অর্থাৎ সত্যের দিকে অগ্রসর হয় না।] অথচ হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-কে সৃষ্টিই করা হয়েছে কল্যাণের উৎসের প্রতি নিবিষ্ট হওয়া এবং রহমান খোদার রসূল (সা.)-এর প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার বৈশিষ্ট্য দিয়ে। নবুয়্যতের বৈশিষ্ট্য প্রকাশের ক্ষেত্রে তিনি সকল মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি যোগ্য এবং সর্বশ্রেষ্ঠ মানব মহানবী (সা.)-এর খলীফা হওয়ার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত ছিলেন। তিনি তার অনুসৃত নেতা (সা.)-এর সাথে পরম সংগতি ও সামঞ্জস্য রাখার যোগ্য ছিলেন। অনুরূপভাবে তিনি সকল নৈতিক গুণাবলী ও অভ্যাস অবলম্বন করা এবং আপন-পর সবার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার ক্ষেত্রে মহানবী (সা.)-এর এমন প্রতিচ্ছবি ছিলেন যে, তরবারি ও বর্শার জোরেও তাঁদের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ছিন্ন হয় নি, আর সারা জীবন তিনি এমনই ছিলেন। বিপদাপদ, ভয়ঙ্কর হাতিয়ার এবং অভিসম্পাত বা তিরস্কার– কিছুই তাঁকে অস্থির করতে পারে নি। তাঁর আত্মিক গুণাবলীর প্রধান বৈশিষ্ট্যই ছিল সততা, স্বচ্ছতা, দৃঢ়চিত্ততা এবং খোদাভীতি। গোটা পৃথিবীও যদি মুরতাদ হয়ে যেতো তাতেও তিনি ভ্রূক্ষেপ করতেন না এবং পিছপাও হতেন না, বরং সদা অব্যাহতভাবে এগিয়ে যেতেন।

এমনি ছিলেন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.), যিনি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা.)-এর ভালোবাসায় নিজেকে বিলীন করে দিয়েছিলেন। বদরী সাহাবীদের স্মৃতিচারণায় সর্বশেষ যে স্মৃতিচারণ চলছিল তা এখানে শেষ হলো। সম্ভবত কতক সাহাবীর বর্ণনা যা আমি প্রথম দিকে করেছি সেগুলোর কিছু বিবরণ পরে হস্তগত হয়েছে; তা কখনো সুযোগ পেলে বর্ণনা করে দেব, অন্যথায় বদরী সাহাবীদের জীবনী যখন ছাপা হবে তখন তাতে সেসব সাহাবীদের বিস্তারিত বিবরণও ছেপে যাবে।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এসব সাহাবীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলার তৌফিক দান করুন, নক্ষত্রের ন্যায় সর্বক্ষেত্রে তারা আমাদের পথপ্রদর্শন করুন এবং তারা যে মানদণ্ড প্রতিষ্ঠিত করেছেন আমরাও যেন সেই মানে উপনীত হতে সচেষ্ট হই। (আমীন)

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)